বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সুমহান বিজয়

তোফায়েল আহমেদ

বিজয়ের মাস ডিসেম্বরের অনেক স্মৃতি আমার মানসপটে ভেসে ওঠে। ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর প্রিয় মাতৃভূমিকে হানাদার মুক্ত করে ত্রিশ লক্ষাধিক প্রাণ আর দুই লক্ষাধিক মা-বোনের আত্মত্যাগের বিনিময়ে মহত্তর বিজয় আমরা অর্জন করি। স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন সামনে নিয়ে দীর্ঘ ২৪ বছর কঠিন সংগ্রাম পরিচালনা করে, ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়েছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন মানুষের হৃদয়ে মহান নেতা বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী গৌরবগাথা অম্লান থাকবে। তিনি এমন একজন মহামানব যার হৃদয় ছিল মানুষের প্রতি ভালোবাসায় পূর্ণ। বাংলার মানুষকে তিনি গভীরভাবে ভালোবাসতেন। বঙ্গবন্ধুর কাছে থেকে তা দেখেছি। বাংলাদেশের এমন কোন স্থান নেই, যেখানে বঙ্গবন্ধুর সফরসঙ্গী হইনি। হৃদয়ের গভীরতা থেকে 'ভাইয়েরা আমার' বলে যখন ডাক দিতেন, মানুষের হৃদয় প্রবলভাবে আন্দোলিত হতো। রাস্তার পাশে গভীর রাতে আধো-অন্ধকারে মানুষ দাঁড়িয়ে থাকতো তাঁকে এক নজর দেখার জন্য। তিনি গাড়ি থামাতেন। মানুষটিকে বুকে টেনে নিতেন। তাঁর সঙ্গে কুশল বিনিময় করতেন, তাকে মনে রাখতেন। সেই মানুষটিও বঙ্গবন্ধুর স্পর্শ পেয়ে নিজকে ধন্য মনে করতেন। তিনি ছিলেন এমন নেতা, যিনি কখনোই কাউকে ছোট মনে করতেন না। কাউকে কখনোই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা হেয় প্রতিপন্ন করতেন না। তিনি পরকে আপন করতে জানতেন। যে তাঁর নীতি-আদর্শে বিশ্বাসী না, সে-ও তাঁর সান্নিধ্যে আপন হয়ে উঠতো। ব্যক্তিত্বের অমোঘ এক মানবিক আকর্ষণ ছিল বঙ্গবন্ধুর। সাগর বা মহাসাগরের গভীরতা মাপা যাবে, কিন্তু বাংলার মানুষের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ভালোবাসা কোনদিনই পরিমাপ করা যাবে না। তিনি ছোটকে বড়ো করতেন, বড়কে করতেন আরও বড়ো। আওয়ামী লীগের প্রত্যেক কর্মীকে তিনি বড় করে তুলতে চাইতেন। কোন নেতা-কর্মীর নির্বাচনী এলাকায় গেলে তাঁর নাম ধরে সম্বোধন করে মানুষের কাছে পরিচয় করিয়ে দিতেন। আমার মানসপটে ভেসে ওঠে '৭০-এর ২৪ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুর ভোলা সফরের স্মৃতি। বরিশাল-পটুয়াখালি-ভোলা একসাথে সফরের কর্মসূচী নির্ধারণ করে একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ মিনারে শহীদদের শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রথমে ২২ ফেব্রুয়ারি বরিশাল, ২৩ তারিখ পটুয়াখালি এবং ২৪ তারিখ ভোলার জনসভায় বক্তৃতা করেছিলেন। সেই জনসভায় স্নেহমাখা ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে তিনি আমাকে ভোলার মানুষের কাছে তুলে ধরেছিলেন। সেই বক্তৃতার কথা বলতে আজ আমার হৃদয় ভাবাবেগে আপ্লুত হয়। আমি যা না তার থেকেও বেশি ঊর্ধ্বে তুলে ধরে—'৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের কথা, কী করে কারাগার থেকে আমরা তাঁকে মুক্ত করেছি, ভোলার মানুষের কাছে তা বলে—আমাকে বড়ো করার চেষ্টা করেছেন। এমন একজন মহান নেতার নেতৃত্বেই '৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর দেশকে আমরা হানাদার মুক্ত করেছি।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরই তিনি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন, এই পাকিস্তান বাঙালিদের জন্য হয়নি। একদিন বাংলার ভাগ্যনিয়ন্তা বাঙালিদেরই হতে হবে। সেই লক্ষ্য সামনে নিয়েই প্রথমে নিজকে, পরে দলকে এবং বাংলার মানুষকে প্রস্তুত করে তিনি তাঁর স্বপ্ন পূরণ করেছেন। তিনি লক্ষ্য নির্ধারণ করে রাজনীতি করতেন। সেই লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য জেল-জুলুম-হুলিয়া-অত্যাচার-নির্যাতন এমনকি ফাঁসির মঞ্চও বেছে নিয়েছেন। কোনদিন লক্ষ্যচ্যুত হননি। দলীয় প্রয়োজনে মন্ত্রীত্ব ছেড়ে দলের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বভার যেমন কাঁধে তুলে নিয়েছেন, আবার জাতীয় প্রয়োজনে দলের শীর্ষ পদ ছেড়ে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন। পৃথিবীতে অনেক নেতা এসেছেন, আসবেন; কিন্তু মানবদরদী এমন নেতা অতুলনীয়। আজ বিজয়ের এই দিনে হৃদয়ের সবটুকু অর্ঘ্য ঢেলে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করি।

১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর বিকাল ৪-৩০ মিনিটে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ আর আমাদের মহান বিজয় সূচিত হওয়ার সাথে সাথে আমি ছুটে গিয়েছিলাম কলকাতাস্থ থিয়েটার রোডে অবস্থিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সদর দপ্তরে। সেখানে অবস্থান করছিলেন শ্রদ্ধেয় নেতৃবৃন্দ—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, মন্ত্রীপরিষদ সদস্য সর্বজনাব মনসুর আলী, কামারুজ্জামান এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সকলেই আনন্দে আত্মহারা! নেতৃবৃন্দ আমাদের বুকে টেনে নিয়ে আদর করেন। প্রিয় মাতৃভূমিকে আমরা হানাদার মুক্ত করেছি, মনের গভীরে যে উচ্ছ্বাস আর আনন্দ; সে আনন্দ-অনুভূতি অনির্বচনীয়! স্বাধীন বাংলার যে ছবি জাতির পিতা হৃদয় দিয়ে অঙ্কন করে নিরস্ত্র বাঙালি জাতিকে সশস্ত্র করে বজ্রকণ্ঠে বলেছিলেন, 'কেউ আমাদের দমাতে পারবে না।'

হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে অদম্য বাঙালী জাতি নেতার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে সমগ্র বিশ্ববাসীকে বুঝিয়ে দিয়েছিল জাতীয় মুক্তির ন্যায্য দাবীর প্রশ্নে কেউ আমাদের 'দমাতে' পারে না।

'৭১-এর ৩ ডিসেম্বর সার্বিকভাবে মুক্তিযুদ্ধ চূড়ান্তরূপ অর্জন করে। আমরা তখন বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে। মুক্তিবাহিনীর চতুর্মুখী গেরিলা আক্রমণে বিধ্বস্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনী এদিন উপায়ান্তর না দেখে একতরফাভাবে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। পাকিস্তান বিমানবাহিনী পশ্চিম ভারতের বিমান ঘাঁটিগুলো এমনকি দিল্লীর কাছে আগ্রার বিমানক্ষেত্র এবং পূর্ব ফ্রন্টের আগরতলা বিমান ঘাঁটিতে অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি ও উর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে জরুরী বৈঠক শেষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ভারতীয় সময় রাত ১০-৩০ মিনিটে সারা ভারতে জরুরী অবস্থা জারি করেন। রাত ১২-২০ মিনিটে ইন্দিরা গান্ধী এক বেতার ভাষণে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে সাফ জানিয়ে দেন, 'আজ এই যুদ্ধ ভারতের যুদ্ধ হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করলো।' পরদিন ৪ ডিসেম্বর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ যৌথভাবে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবরে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি অর্জনে চিঠি লেখেন। চিঠির মূল বক্তব্য ছিল, 'যদি আমরা পরস্পর আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্কে প্রবেশ করি, তবে পাকিস্তান সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে আমাদের যৌথ অবস্থান অধিকতর সহজতর হয়। অবিলম্বে ভারত সরকার আমাদের দেশ এবং আমাদের সরকারকে স্বীকৃতি প্রদান করুক।' এর পরপরই ভারত পাল্টা আক্রমণ চালায় এবং ৬ ডিসেম্বর, সোমবার, ভারতীয় সময় সকাল সাড়ে ১০টায় ভারত সরকার স্বাধীন ও সার্বভৌম 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ'কে স্বীকৃতি প্রদান করে। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক '৭১-এর ১০ এপ্রিল স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে গৃহীত রাষ্ট্রের নাম 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' উদ্ধৃত করে লোকসভার অধিবেশনে ইন্দিরা গান্ধী বলেন, "বাংলাদেশ 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' নামে অভিহিত হবে।" ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তৃতার পর লোকসভার সকল সদস্য দাঁড়িয়ে তুমুল হর্ষধ্বনির মাধ্যমে এই ঘোষণাকে অভিনন্দন জানান। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভারত সরকার ও জনসাধারণের ভূমিকা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার ও মুজিববাহিনীর জন্য ৬ ডিসেম্বর ছিল এক বিশেষ দিন। এদিন মুজিববাহিনীর অন্যতম প্রধান হিসেবে আমার দায়িত্বপ্রাপ্ত অঞ্চল যশোর হানাদার মুক্ত হয়। যশোরের সর্বত্র উত্তোলিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। সেদিন সরকারের নেতৃবৃন্দ ও মুজিববাহিনীর কমান্ডারগণসহ আমরা বিজয়ীর বেশে স্বাধীন বাংলাদেশের শত্রুমুক্ত প্রথম মুক্তাঞ্চল যশোরে প্রবেশ করি। জনসাধারণ আমাদের বিজয়মাল্যে ভূষিত করে। সে আনন্দ অনুভূতির কথা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মনে পড়ে, জেনারেল ওবানের কথা। তিনি দেরাদুনে আমাদের ট্রেনিং দিতেন। জেনারেল সরকার ও শ্রী ডি পি ধর, যাঁরা আমাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করে কো-অর্ডিনেট করতেন। মুজিববাহিনীর হেডকোয়ার্টার ছিল কলকাতা। আমরা মুজিববাহিনীর চার প্রধান প্রতি মাসেই মিলিত হতাম। দেরাদুনের ট্রেনিং ক্যাম্পে গিয়ে আমরা বক্তৃতা করতাম। তারপর যার যার স্থানে চলে যেতাম। আমাদেরকে যিনি সার্বিক সহযোগিতা করতেন, তিনি হলেন ফনীন্দ্র নাথ মুখার্জী, তথা পিএন মুখার্জী। যাকে আমরা 'মিস্টার নাথ' বলে সম্বোধন করতাম। যিনি মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগেই অর্থাৎ '৬৯-এর অক্টোবরে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে লন্ডনে দেখা করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ভারত সরকারের ভূমিকা কী হবে তা বঙ্গবন্ধুকে অবহিত করেছিলেন। যুদ্ধকালীন অর্থকড়ির ব্যবস্থা তাঁর মাধ্যমেই হয়েছিল। তাকেও আজ গভীরভাবে মনে পড়ে। অনেকে বাংলাদেশ সরকারের সাথে মুজিববাহিনীর ভুল বোঝাবুঝির কথা বলেন। এটা সঠিক নয়। আমি নিয়মিত সরকারের সাথে যোগাযোগ করতাম। এখানে কারও ব্যক্তিগত খামখেয়ালির কোনো অবকাশ ছিল না। সকলেই সুসংগঠিত-পরিকল্পিত-সুশৃঙ্খল। সমগ্র বাংলাদেশকে ৪টি বৃহৎ অঞ্চলে বিভক্ত করে রাজনৈতিকভাবে অগ্রসর মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে সংগঠিত ছিল মুজিববাহিনী। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত প্রধান সেনাপতি আতাউল গণী ওসমানীর নেতৃত্বে গঠিত বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর (এফএফ) সাথে একত্রে যুদ্ধ করে দখলদার বাহিনীকে মোকাবেলা করাই ছিল মূলত মুজিববাহিনীর কাজ। মুজিববাহিনীর অন্যতম প্রধান হিসেবে শ্রদ্ধেয় নেতা শেখ ফজলুল হক মণি ভাইয়ের দায়িত্বে ছিল তৎকালীন চট্টগ্রাম ডিভিশন ও বৃহত্তর ঢাকা জেলা; রাজশাহী বিভাগ (পাবনা ও সিরাজগঞ্জ বাদে) ও উত্তরাঞ্চলের দায়িত্বে ছিলেন সিরাজুল আলম খান; আবদুর রাজ্জাকের দায়িত্বে ছিল বৃহত্তর ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল এবং সিরাজগঞ্জসহ এক বিরাট অঞ্চল, আর আমার দায়িত্বে ছিল পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল এবং পটুয়াখালী জেলা। মুজিববাহিনীর ট্রেনিং হতো দেরাদুনে। দেরাদুনে ট্রেনিং শেষে আমার সেক্টরের যারা তাদের প্লেনে করে ব্যারাকপুর ক্যাম্পে নিয়ে আসতাম। মুজিববাহিনীর সদস্যদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশের প্রাক্কালে বুকে টেনে, কপাল চুম্বন করে বিদায় জানাতাম। আমরা মুজিববাহিনীর ট্রেনিং ক্যাম্পে বক্তৃতায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু মুজিবকে উদ্দেশ করে বলতাম, 'প্রিয় নেতা, তুমি

কোথায় আছো, কেমন আছো জানি না! যতদিন আমরা প্রিয় মাতৃভূমি তোমার স্বপ্নের বাংলাদেশকে হানাদার মুক্ত করতে না পারবো, ততদিন আমরা মায়ের কোলে ফিরে যাবো না।' ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১৬ ডিসেম্বর যেদিন দেশ শত্রুমুক্ত হলো সেদিন আমরা বিজয়ীর বেশে মায়ের কোলে ফিরে এলাম। ১৮ ডিসেম্বর আমি এবং আব্দুর রাজ্জাক—আমরা দু'ভাই হেলিকপ্টারে ঢাকায় আসি। স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে পদার্পণ করি। চারদিকে সেকি আনন্দ, ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব না! প্রথমেই ছুটে গিয়েছিলাম—বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী শ্রদ্ধেয়া বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, আজকের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা, শেখ রাসেলসহ—বঙ্গবন্ধু পরিবারকে যেখানে বন্দী করে রাখা হয়েছিল সেখানে। বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামাল মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন এবং মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি কর্নেল ওসমানীর এডিসি ছিলেন এবং শেখ জামাল দেরাদুনে আমার সঙ্গেই ছিল। কিন্তু বিজয়ের আনন্দ ছাপিয়ে কেবলই মনে পড়ছিল প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুর কথা। যে স্বাধীন বাংলার স্লোগান তুলেছিলাম রাজপথে; যে বাংলার জন্য বঙ্গবন্ধুর গতিশীল নেতৃত্বে কাজ করেছি; পরমাকাঙ্ক্ষিত সেই বাংলাদেশ আজ স্বাধীন হয়েছে। আজ আমরা হানাদার মুক্ত, স্বাধীন।

বাংলাদেশ সরকারের নেতৃবৃন্দ অপূর্ব দক্ষতায়, দল-মত-শ্রেণী নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে, আস্থা ও বিশ্বাসে নিয়ে সফলভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন ২২ ডিসেম্বর। বিমানবন্দরে নেতৃবৃন্দকে বিজয়মালা দিয়ে অভ্যর্থনা জানাই। রাজপথে লক্ষ লক্ষ মানুষ। মুক্তিযুদ্ধের রণধ্বনি 'জয়বাংলা' স্লোগানে সর্বত্র মুখরিত। চারদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের মহাসমাবেশ আর আনন্দ মিছিল। মানুষ ছুটে আসছে আমাদের দেখতে। বিজয়ের সেই সুমহান দিনগুলোতে সাধারণ মানুষের চোখে-মুখে গৌরবের যে দীপ্তি আমি দেখেছি, সেই রূপ বিজয়ের গৌরবমণ্ডিত আলোকে উদ্ভাসিত। স্বজন হারানোর বেদনা সত্ত্বেও প্রত্যেক বাঙালীর মুখে ছিল বিজয়ের হাসি; যা আজো আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কিন্তু বিজয়ের আনন্দ ছাপিয়ে কেবলই মনে পড়ছিল প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুর কথা। যার সাথেই দেখা হয়, সকলের একই প্রশ্ন, 'বঙ্গবন্ধু কোথায় আছেন, কেমন আছেন, কবে ফিরবেন?' বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য সর্বস্তরের মুক্তিকামী বাঙালীর ঘরে ঘরে রোজা রাখা, বিশেষ দোয়ার আয়োজন চলছিল। বঙ্গবন্ধু বিহীন বিজয় অপূর্ণ। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে অক্টোবরে বঙ্গবন্ধুর ফাঁসির আদেশ হয়েছিল। দেশ স্বাধীন না হলে ডিসেম্বরেই বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো হতো। কিন্তু আমরা জানতাম বীর বাঙালীর উপর নেতার আস্থার কথা। তিনি তো গর্ব করে বলতেন, 'ওরা আমাকে হত্যা করতে পারে। কিন্তু বাংলার মানুষকে তারা দাবিয়ে রাখতে পারবে না। ওরা আমাকে হত্যা করলে লক্ষ মুজিবের জন্ম হবে।' ১৬ ডিসেম্বর হানাদার মুক্ত হয়ে বিজয় অর্জন করার পরেও আমরা নিজদেরকে স্বাধীন ভাবতে পারিনি। কারণ, বঙ্গবন্ধু তখনও পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী। আমরা পরিপূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করেছি সেদিন, যেদিন '৭২-এর ১০ জানুয়ারি বুকভরা আনন্দ আর স্বজন-হারানোর বেদনা নিয়ে জাতির পিতা তাঁর স্বপ্নের স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে এসেছিলেন।

ডিসেম্বরের ১৪ তারিখ বাঙালী জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবীদের পূর্বপরিকল্পিত নীলনকশানুযায়ী নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিল পাকিস্তানীদের দোসর এদেশীয় রাজাকার-আলবদর বাহিনীর ঘাতকেরা। ডিসেম্বর মহান বিজয়ের গৌরবমণ্ডিত মাস হলেও ১৪ ডিসেম্বর আমাদের বেদনার দিন। মনে পড়ে নির্ভীক সাংবাদিক শহীদ সিরাজুদ্দীন হোসেনের কথা। যাঁর কাছে আমি ঋণী। '৬৯-এর গণ-আন্দোলনের অগ্নিঝরা দিনগুলোতে যিনি আমাকে বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। মনে পড়ে শহীদ বুদ্ধিজীবী সর্বজনাব মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, গিয়াসউদ্দীন আহমদ, আনোয়ার পাশা, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, ড. আবুল খায়ের, শহীদুল্লাহ কায়সারসহ শহীদ বুদ্ধিজীবীদের কথা। জাতির মেধাবী সন্তানদের হত্যা করার মধ্য দিয়ে ঘাতকেরা আমাদের মেধাহীন জাতিতে পরিণত করতে চেয়েছিল।

মহান মুক্তিযুদ্ধের রক্তঝরা দিনগুলোতে সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল জাতির পিতার ডাকে দেশমাতৃকার স্বাধীনতার সূত্রে। জাতীয় ঐক্যের অভূতপূর্ব নিদর্শন ছিল সেই দিনগুলো। ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী-কৃষক-শ্রমিক-যুবক সকলেই আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ অংশগ্রহণে সফল জনযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জন করেছি সুমহান বিজয়। আর এখানেই নিহিত আছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু মুজিবের ঐতিহাসিক সাফল্য। স্বাধীনতার ডাক দিয়ে একটি নিরস্ত্র জাতিকে তিনি সশস্ত্র জাতিতে রূপান্তরিত করেছিলেন। আমরা সেদিন স্লোগান দিয়েছি, 'জাগো জাগো বাঙ্গালী জাগো'; 'পিন্ডি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা'; 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা'; 'বীর বাঙ্গালী অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো'; 'জয় বাংলা' ইত্যাদি। সেদিন কে হিন্দু, কে মুসলমান, কে বৌদ্ধ, কে খ্রীস্টান এসব প্রশ্ন ছিল অবান্তর। আমাদের মূল স্লোগান ছিল 'তুমি কে? আমি কে? বাঙালী, বাঙালী।' আমাদের পরিচয় ছিল 'আমরা সবাই বাঙালী'। অথচ ভাবতে অবাক লাগে, যে পাকিস্তানের কারাগার বঙ্গবন্ধুকে আটকে রাখতে পারেনি; মৃত্যুদণ্ড দিয়েও কার্যকর করতে পারেনি—প্রধানমন্ত্রী

হয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটাকে যখন তিনি স্বাভাবিক করলেন, যখন অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দিলেন, ঠিক তখনই '৭৫-এর ১৫ আগস্ট স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে পরাজিত শক্তির দোসর খুনি মোশতাক-রশীদ-ফারুক-ডালিম চক্র বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করলো! যে স্বাধীনতা বিরোধীরা মাকে ছেলেহারা, পিতাকে পুত্রহারা, বোনকে স্বামীহারা করেছিল; জেনারেল জিয়া তাদেরকে রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করে মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে সংবিধান থেকে উৎপাটিত করেছিল। পরাজিত শক্তির পুনরুত্থান ও দীর্ঘকাল রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালে প্রতি মুহূর্তে যে বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছি—তাতে কেবলি মনে হয়েছে, বিজয়ের আনন্দ ক্ষণস্থায়ী, আর পরাজয়ের গ্লানি দীর্ঘস্থায়ী!

আজ শুধু ভাবি মহাকালের চাকাটিকে অতীতের দিকে ঘুরিয়ে যদি ৫০ বছর পেছনে নিয়ে যাওয়া যেতো তবে যুদ্ধজয়ের স্মৃতি-বিজড়িত কথা কাগজের পৃষ্ঠায় বা লেখার অক্ষরে না, বরং সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে থাকতো মহান মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক বঙ্গবন্ধুর জ্যোতির্ময় সশরীর উপস্থিতি। সুদর্শন, সৌম্যকান্তি, তোজোদ্দীপ্ত এই মহান মানুষটির দিকে তাকিয়ে থাকতেও ভালো লাগতো। অমিতবিক্রম তেজে তিনি আমাদের নেতৃত্ব দিয়েছেন, সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে দিয়ে গেছেন মহান মুক্তিযুদ্ধের দিকনির্দেশনা। দু'টি লক্ষ্য নিয়ে বঙ্গবন্ধু রাজনীতি করেছেন। একটি, স্বাধীনতা—যেই স্বাধীনতার ডাক তিনি দিয়েছিলেন '৭১-এর ২৬ মার্চ, যা পূর্ণতা লাভ করেছে ১৬ ডিসেম্বর। আরেকটি, বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা। সেই লক্ষ্যেই তিনি দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচী দিয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবায়ন করে যেতে পারেননি। আজকে যদি দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচী বঙ্গবন্ধু বাস্তবায়ন করতে পারতেন, তবে বহু আগেই বাংলাদেশ মালয়েশিয়াকে ছাড়িয়ে যেতো। আজ বঙ্গবন্ধু নেই, টুঙ্গীপাড়ায় নিভৃতপল্লীতে চিরনিদ্রায় শায়িত। আর কোনদিন আসবেন না। কিন্তু তাঁর রক্তের ও চেতনার উত্তরসূরী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা—বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পতাকা যার হাতে '৮১ সালে আমরা তুলে দিয়েছিলাম; সেই পতাকা হাতে নিয়ে নিষ্ঠার সাথে, সততার সাথে দল পরিচালনা করে চারবার আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছেন! তারই সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ আন্তর্জাতিক বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। উন্নয়নের এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে আসন্ন নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বপ্রদানকারী দল আওয়ামী লীগ পুনরায় গণরায় নিয়ে সরকার গঠন করবে এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচী—শোষণমুক্ত, ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশ গঠন করবে। এবারের বিজয় দিবসে জাতির কাছে এই আমাদের অঙ্গীকার।

#

লেখক ঃ আওয়ামী লীগ নেতা; সংসদ সদস্য; সভাপতি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, জাতীয় সংসদ

পিআইডি ফিচার